ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 973-978
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.092**

# রবীন্দ্র দর্শনে মানুষের ধারণা: একটি সমীক্ষা

**রনজয় খাঁ**, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,বড়জোড়া কলেজ, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত***

Received: 11.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

*Human beings are a unique creation of nature. The essence of humanity lies in their intrinsic quality, which is humanity itself. This is what sets humans apart from all other living beings. According to Rabindranath Tagore, humanity fundamentally means creativity. In his writings, he has portrayed the true essence of humans, their potential, their spiritual desires, and their eternal nature, reflecting these through an inner lens. Tagore observed two dimensions within humans: the finite self the and the infinite. The finite self represents humans as mere biological beings, confined within their individual existence. This self is driven by self-interest, focusing only on personal needs, and struggles to rise above biological instincts. It is deeply tied to ego and individuality. In contrast, the infinite self transcends individual boundaries and connects with all of humanity. This higher self inspires people to engage in noble acts for the greater good.*

***Key word*:** *Humans, Creativity, Infinite self, Finite self, Biological*

প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি হল মানুষ। মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এই সাধারণ ধর্মটিই মানুষকে অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণীদের থেকে পৃথক করে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাই আমরা 'মনুষ্যত্ব' বলতে বুঝি সৃজনশীলতা। মানুষ সৃজনশীলতাকে জন্মগতভাবে পেলেও তার প্রকাশ পাই মানুষের আচরণে। বুদ্ধিমত্তা, আচরণ প্রভৃতি মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করে। মানব সত্তার চরিত্র অনেক জটিল। এই মানব সত্তার সঙ্গে জড়িত নানা বৃত্তি, নানা আকুতি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি এই তিনটি বৃত্তি নিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতে প্রকাশিত হয়েছে মানুষের স্বরূপ, মানুষের সম্ভাবনার কথা, আত্মিক চাওয়া পাওয়ার কথা, মানুষের এই সব মৃত্যুঞ্জয়ী স্বরূপের কথা ব্যক্ত হয়েছে অন্তরের নিরিখে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা লক্ষ্য করেছেন। একটি তার জীবসত্তা বা সমীম সত্তা বা ছোটো আমি এবং অপরটি  হল অসীম সত্তা বা বড় আমি।

জীবসত্তা হিসেবে মানুষ একটি জীবমাত্র এবং তার নিজস্ব সত্তার উপস্থিতিকে বেঁধে রাখতে চায়। সত্তাটি সব সময় নিজের মধ্যে থাকতে চায়, নিজের প্রয়োজন ব্যাতিত অন্য কিছু ভাবে না, মানুষ এই সময় তার জীববৃত্তিকে অন্য অবস্থা থেকে পৃথক করতে পারে না। নিজের অহংবোধ সব সময় প্রকাশিত হয়। দেহের প্রয়োজনই তাদের জীবন। অন্যান্য প্রাণীর মত তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হ্রাস-বৃদ্ধি, সংগ্রাম, আত্মরক্ষা ইত্যাদি আছে। অন্যান্য জীব বা মানুষ এক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ। তার ভোগসামগ্রমী অন্য কাউকে দিতে রাজি নয়। কাজেই দেখা যায় দ্বন্দ্ব, বলপ্রয়োগ, হানাহানি, মারামারি। কারণ, মানুষই তার দেহের এই ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই জীব এক  জায়গায় থেমে থাকে না। জীবকোষের বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, দেহ গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষের এই জীবসত্তা ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, সেক্ষেত্রে অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য থাকত না।

রবীন্দ্রনাথ সসীম সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, যে দিকটাতে আমি, কেবলমাত্র আমি, সকল অবস্থাতেই শুধুই আমি যেমন, কেবল আমার সুখ, দুঃখ, আমার আরাম, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা, যে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে পেতে চাই, সেই দিকটিতে আমার চেয়ে ছোটো আর কেউ নয়। এই দিক দিয়ে দেখলে আমরা সকলেই খুব ছোটো। আমোদ, প্রমোদ, প্রয়োজন এই সব ক্ষেত্রে সকলকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেকে দেখতে চাই। এখানে আমি একটি বিন্দুর সমান। এখানে আমার থেকে ছোটো আর কেউ নেই। এই জগতে মানুষের একটি অস্তিত্ব আছে। যদিও মানুষের অস্তিত্ব সীমিত। তিনি বলেছেন আমরা সকলেই একই প্রকারের বিশেষ আমি। 'আমিত্ব' বলে বস্তুটিই আমাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে আলাদা করে রাখে। আমি যখন ভাবচ্ছি যে আমি আছি তখন এই ভাবটি পৃথিবীর সীমাহীন উপস্থিতির মাঝে আমি শুধু 'একা'। এই 'আমি ভাবটাই' সমস্ত বিশ্বজগৎ থেকে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। এখানে তিনি বদ্ধ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর আমির কথাই বলেছেন। এই 'আমি' 'পরমআমি'র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। এক বিশেষ সময়ে মানুষ চতুস্পদ প্রাণী হিসাবে বেঁচে থাকতে অস্বীকার করেছিল। প্রকৃতির পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃণভোজী প্রাণীদের দুটি পা, একটি শুঁড় এবং শুঁড়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে মাথা দেওয়া হয়। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মেনে নেয় নি। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কষ্ট করে দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> "নীচের দিকে ঝুকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভুতি দেহ বৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।"[১]

এইভাবে মানুষ জীব সত্তাকে অতিক্রম করে তার আধ্যাত্মিক সত্তায় উপনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে মানব প্রকৃতির দিকটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যখনই আমরা ভালো কিছু করতে চাই এবং তার জন্য অনেক কষ্ট ভোগও করি এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি থাকি তখন আমরা এই সত্তার অনুভূতি টের পায়। মানুষ এই সত্তাটিকে ক্রমাগত নিজের ব্যক্তিগত সীমানাকে অতিক্রম করতে চাই। বিশ্বের সকল মানুষকে একাত্ব রূপে দেখতে চাই। এই অসীম সত্তাতেই মানুষের পূর্ণতা। এমন কোন কাজ নেই যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সে বারবার চেষ্টা করে, বিফল হয়। এই বিফলতায় সেই কাজ কে পুনরায় করার প্রেরণা দেয়। অতিরিক্ত জীবনী শক্তি মানুষের উদ্যম। এই অতিরিক্ত জীবন শক্তি নিজেদের সাধারণ সত্তার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। অসীম সত্তার জন্য মানুষের মুক্তি এবং অমরতা লাভের জন্য হয়ে ওঠে ব্যাকুল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও মানুষের চেতনায় মানুষকে অমরতা লাভের জন্য চালিত করে। অসীমতার চেতনায় মানুষকে অমরতার দিকে ধাবিত করে এবং বিশ্বচরাচরকে আপন ভাবতে সাহায্য করে। মানুষের জীব সত্তা যেখানে বাঁধা অসীম সত্তা সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্ত আকাশের অভিসারী হয়। জন্তুদের মতো নিম্নগামী জীবন কাটাতে পারে না মানুষ। দূরের দিকে চক্ষু উন্মিলিত করতে হয়। সেই পথ বড় বন্ধুর মত। এই পথে বিশ্রাম নেই, আরাম নেই, এই সত্তা পথকে কেবলই অশান্ত করেছে, করেছে উন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;

> "দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
> মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তার কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানিনা কে। চিনি না তারে-
> শুধু এটুকু জানি-তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলছে মানব যাত্রী যুগ হত যুগান্তরে-পানে
> ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
> অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনছে কানে
> তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
> সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছে সে পক্ষপাতী; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।"[২]

অসীম সত্তা ব্যক্তি মানুষের মন অতিক্রম করে সকল মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই সত্তার কাজ হল সকল ব্যক্তি মানুষের জন্য অবস্থান করে মহৎ কর্মে প্রেরণা দেওয়া। বহু চেষ্টা করে মানুষ খুঁজে পেয়েছে সেই অন্তরের সত্তাকে, যে সত্তা বাস্তব সত্তার চেয়ে মহৎ। যার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে অচিন পাখি অন্তরে আসা-যাওয়া করে। এই সত্তায় মানুষকে মনে করিয়ে দেয় বাস্তব পরিচয়ের উপরেও আর একটি বড় পরিচয় আছে।

অসীম সত্তা বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সৃষ্টির ক্রিয়া-কলাপ চলতে থাকে। এই অসীম সত্তা হল মানুষের উদ্বৃত্তের পরিচালক। ব্যক্তি সত্তার সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যেখানে নিখিল ভুবনে পদার্পণ করে, সেখানেই সৃষ্টির ক্ষেত্র। এটিই হল মানুষের উদ্বৃত্ত সত্তা। এই উদ্বৃত্ত সত্তাটি তিনি অথর্ববেদ থেকে গ্রহণ করেছেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে-

"ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।"

"ঋতসত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ, বীর্য, সম্পদ, বল সবকিছুই উচ্ছিষ্টে বা উদ্বৃত্তে আছে। অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীব জগতে মানুষের বাড়তি ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবানুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত হয় ভূত-ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদে তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম।"[৩]

এই উদ্বৃত্ত সত্তাতে সত্য, সুন্দর, তপস্যা ও মঙ্গল এইসব গুণগুলি দেখা যায় এবং এই গুণগুলির যখন প্রকাশ ঘটে তখন মানুষ নিজের পরমাত্মাকে সত্তাকে উপলব্ধি করে।

রবীন্দ্রনাথের মতে অসীম সত্তা উদ্বৃত্তের নামান্তর। অসীম প্রকৃতির সব থেকে বড় দিকটি হল আনন্দের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই উপলব্ধি মানুষকে দেহের উর্ধ্বে নিয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খন্ডভূমি থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচি থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এতেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পাই বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পাই বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহেতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।"[৪]

অসীম সত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সে নিজের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে মানুষ সাধারণ জীব মাত্র সেখানে সে জৈবিক কাজকর্মের অধীন। এখানে মানুষ প্রয়োজনের দাস। যেখানে মানুষ মুক্ত সেখানেই সৃজনশীলতার ক্ষেত্র। মানুষের শক্তি কাজের জগতে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োজিত থাকে। জৈবতার ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি নিঃশেষিত নয় এবং বাইরে আছে উদ্বৃত্তের শক্তি, যা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিয়োজিত। অধ্যাপক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন,

"ব্যক্তির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক অর্থে জাতির তুলনা করা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি একটি ভৌগলিক খন্ড অধিকার করে একটি জাতি গড়ে তোলে। ব্যক্তির যেমন নিজের স্বার্থের গন্ডির মধ্যে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল, তেমন জাতির ক্ষেত্রে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক

নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল হয়। ওই জাতির অবস্থিতি এক বিশেষ ভূখণ্ডে নয়, সেই ভূখন্ডে যে মানুষগুলি বাস করে তাদের মনের মধ্যেই। জাতিবোধরূপে তা জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যক্তি মানুষকে অবলম্বন করেই তা ক্রিয়াশীল। জাতি গড়ে তোলবার এবং জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হল আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে উদয় হয় তাকে তার ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ডি ডিঙিয়ে বৃহত্তর কল্যাণ কর্মে প্রণোদিত করে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্তের কথা বলেছেন, এই উদ্বৃত্ত হল মানুষের ঐশ্বর্য। এই অতিরিক্তের প্রকাশ ঘটলেই ব্যক্তি স্বরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। শিল্প সাহিত্য ও সংগীত ইত্যাদিতে মানুষের এই অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশেই মানুষের যত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গোপণে বসবাসকারী সত্তাটি মানুষকে মহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। মানুষের সকল কীর্তিময় কর্মের ফলশ্রুতি এই সত্তাটি। তিনি ব্যক্তি মানুষকে শিল্পী করেন। তিনি মানুষের মধ্যে থাকেন এবং সকল মানুষকে ব্যাপ্ত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ অসীম বা আধ্যাত্মিক সত্তাটিকে বোঝার জন্য নানা শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে 'বড়ো আমি' আবার 'The Religion of Man' গ্রন্থে Man The Eternal আবার 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'মানবব্রহ্ম' বলে অভিহিত করেছেন। কখন 'প্রাণের মানুষ', 'মহামানব' আবার কখন বা 'অন্তর্যামী' নামেও অভিহিত করেছেন। আবার তিনি এই মহান সত্ত্বাটিকে বিশ্ব মানব বলে চিহ্নিত করেছেন। একটি গানের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটি ফুটে উঠেছে-

"পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী, অন্তরে আমি দেখেছি তোমারে
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয় শতদল মাঝে,
হেরিনু একি অপরূপ রূপ।।"[৬]

বিশ্বমানব সত্তার কাজ হল সকল ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মহৎ কার্যে প্রেরণা দেওয়া। এই সত্তার মধ্যেই সৃষ্টির কার্যকলাপ চলতে থাকে। বিশ্বমানবসত্তা হল মানুষের উদ্বৃত্তের পরিচালক। আমরা উপলব্ধির দ্বারা অসীমসত্তা বা বিশ্বমানবসত্তার স্বরূপকে জানতে পারি, কিন্তু উপলব্ধির মূল বাধা হল অহংভাব। মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এই অহং ভাবের জন্য। নিজের সঙ্গে বিশ্বজগতের সম্পর্ক আপাত বিরোধের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের অবসান ঘটলেই বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলি, তখন অপরের সুখ-দুঃখ, প্রীতি, প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারি। এইরকম উপলব্ধি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে লক্ষ্য করি –

"...দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলিওয়ালা আর আমি একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয় তা ভুলিয়া গেলাম... তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা।"[৭]

আমরা যখনই ভালো কিছু করতে যাই এবং তার জন্য অনেক কষ্ট ভোগও করি এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি থাকি তখন আমরা এই সত্তার অনুভূতির টের পাই। মানুষের এই সত্তাটি ক্রমাগত নিজের ব্যক্তিগত সীমানাকে অতিক্রম করতে চাই। বিশ্বের সকল মানুষকে একাত্তরূপে দেখতে চাই। এই অসীম সত্তাতেই মানুষের পূর্ণতা।

সকল মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা রয়েছে যা মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মানুষকে অসীমের পথে চালিত করে। এই সত্তাকে তিনি পরমসত্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তিনি পরমসত্ত্বাকে পেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে সেই পরমসত্তার কাছে যেতে হবে। জগতে সর্বত্র পরমসত্তার রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এই পরমসত্তাই পৃথিবীর পালনকর্তা, আর পরমসত্তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই হল মানুষের ধর্মবোধ। কেউ তাকে জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করে পেতে চেয়েছেন, কেউ তাকে কর্মের মাধ্যমে আবার কেউ তাকে ভক্তির মাধ্যমে পেতে চেয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে এই পরমসত্তা। একেই রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় 'জীবনদেবতা' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি 'জীবনদেবতাকে' জীবনের কর্ণধার বলে মনে করতেন। এই জীবনদেবতা মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন।

মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কটি হল পরিচালক ও অভিনেতার মত। পরিচালক ও অভিনেতা দুজনেই ব্যক্তিরূপীসত্তা দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। পরিচালক অভিনয় করেন না, অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করান। অভিনেতা ভালো অভিনয় করলে পরিচালক তৃপ্তি পান। আনন্দ পান আবার খারাপ অভিনয় করলে বেদনা পান। অভিনেতার ভিতর দিয়ে নিজের তৃপ্তি খোঁজেন না। অনুরূপভাবে জীবনদেবতা জীবনের অভিনয়েও আছেন এবং বাহিরেও আছেন। তিনি ব্যক্তি মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেন। আমরা ভালো কাজ করলে তিনি আনন্দ পান খারাপ কাজ করলে তিনি দুঃখ পান, আমাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হন দুঃখে দুঃখী হন। এই 'জীবনদেবতা' রূপী পরমসত্তাটি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। ইনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, ইনি ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। ভক্তের জীবন সার্থক হলেই তাঁর নিজের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নিচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেরশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে"।[৮]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই হল সীমার মাঝে অসীম লীলা। এখানে ঈশ্বর ও ভক্ত উভয়ে মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করেছেন।

অহং ও আত্মার মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অহং ও আত্মার দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করেছেন এই রকম করে। তিনি বলেছে–

> "শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবনধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে 'শত্রুকে ক্ষমা কর' এই কথাটা জীবনধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।"[৯]

এই আমি ক্ষুদ্র স্বার্থ সংস্কারবদ্ধ, এই আমিত্ববোধ অন্য সব কিছু থেকে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "এই যে আমিত্ব বলে একটা জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমি হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচর কে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে মানুষ ও ব্রহ্মের তিনটি স্বরূপের পার্থক্য করেছেন। ব্রহ্মের মতো মানুষেরও তিনটি স্বরূপ - যেমন 'আমি আছি', 'আমি জানি' ও 'আমি প্রকাশ করি'। প্রথমটি হল মানুষের প্রবৃত্তির দিক এখানে মানুষ নিজেকে রক্ষা করে, বংশ রক্ষা করে ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি মানুষের জ্ঞানের দিক, জ্ঞান মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। তৃতীয়টি অন্যের সঙ্গে মিলনের জন্য মানুষ নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। 'আমি আছি' এটি ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের অন্তর্গত 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত এবং 'আমি প্রকাশ করি' - এক্ষেত্রে মানুষ প্রাচুর্যকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। এটি হল মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যা মানুষের আনন্দের দিক। আবার এটিকে উদ্বৃত্তের দিক ও বলা যায়। 'আমি আছি' - এই বোধের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে চেনে ও জানে। এই জানার মধ্য দিয়েই মানুষের আত্ম উপলব্ধি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানবসত্তা এক চলমান সত্তা। এই সত্তা নিয়ত প্রগতিশীল, এই প্রগতি ব্যাপকতার দিক থেকে প্রগতি। মানুষ নিরন্তর নিজেকে অতিক্রম করে চলেছে, নিজেকে অতিক্রম করার অর্থ হল সীমিত গণ্ডীর বাইরে যাওয়া। মানবসত্তার এই যে স্বরূপ তার দ্বারা সে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর এবং ব্যাপকতর থেকে ব্যাপকতমের দিকে ধাবমান। এই ব্যাপকতম সত্তা মানবসত্তা প্রকৃতিসত্তা ও পরমসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সুতরাং যথার্থ মানবসত্তা কোন বিছিন্ন সত্তা নয়।

**তথ্যসূত্র:**

১) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬২৩।
২) এবার ফিরাও মোরে, (চিত্রা কাব্যগ্রন্থ) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৩) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৪) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬২৪।
৫) উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নবপত্র, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ১৫৬।
৬) গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পতিতপাবন পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ১৯৫।
৭) কাবুলিওয়ালা, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৮) গীতাঞ্জলি, ১২১ নং কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৮১।
৯) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩৯।
১০) জাগরণ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৫৮৪।

**গ্রন্থপঞ্জী:**

১) রবীন্দ্র রচনাবলী, (দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম খন্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১৭।
২) চক্রবর্তী, বসুধা, মানবতাবাদ, দীপায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।
৩) নিয়গী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০।
৪) পদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯।
৫) ঘোষ, পীযূষকান্তি, মানবধর্ম, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১০ই জুন, ২০০২-০৩।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২৫ শে জানুয়ারী, ১৯৯৫।
৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পতিতপাবন পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১।